২০-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তোমাদের ভাগ্যে আলোর প্রকাশ আনতে। আর নিজেরা পবিত্র-পাবন হতে পারলেই, তোমাদের ভাগ্যের বিকাশ ঘটবে।"

প্রশ্ন :- যে সব বাচ্চাদের ভাগ্য প্রকাশের আলোয় আলোকিত, তাদের মধ্যে এমন কি বিশেষ লক্ষণ থাকে ?

উত্তর :- তিনি দেবতাদের মতনই সুখেতে বিরাজ করেন । অসীমের বাবা (শিব) সুখের আশীর্ব্বাদী বর্সা নিয়ে এসেছেন, সবাইকে সুখ দেবার জন্য। যিনি কখনই কাউকে কোনও প্রকারের দুঃখই দেবে না। যেহেতু তারা হলেন ব্যাসদেবের সন্তান, অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সুখদেব। ২) যিনি ৫ বিকারের সন্ন্যাস (ত্যাগ) করে প্রকৃত রাজযোগী-রাজঋষিতে পরিণত হন। ৩) যিনি সর্বদা নির্দিষ্ট স্মরণে থাকতে পারেন, কোনও কিছুতেই যার মধ্যে দুঃখ বা অনুশোচনা আসে না। কোনও কিছুতেই যার কোনও মোহ থাকে না - অর্থাৎ মোহজীত অবস্থা।

গীত :- তকদীর জাগাকর আয়ী হুঁ ... .। (তোমাদের ভাগ্যকে আলোর দিশা দেখাতেই এসেছি ... . ।)

ওঁম্ শান্তি! গীতের একটা মাত্র বাক্য শুনেই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের রোমাঞ্চের অনুভূতি হচ্ছে অবশ্যই! যদিও এটা বহুল প্রচলিত গীত, কিন্তু এর মর্মার্থ ও সার বস্তুটা সেভাবে অন্যেরা জানেই না। বাবা স্বয়ং এসে এই ধরণের গীতগুলির শাস্ত্রভাব ও মর্মার্থের বিশ্লেষণ করে বোঝান। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এটাও অবগত যে, বর্তমান কলিযুগী এই সময়টায় সবাই ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তমসাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। যা সত্যযুগের আগমনে আবার তার বিকাশ ঘটবে। এই তমসাচ্ছন্ন ভাগ্যকে আলোর দিশা দেখাতে আর শ্রীমত দিতে কিম্বা ভাগ্যের বিকাশ ঘটাতে পারেন - এক ও একমাত্র শিববাবা-ই। যিনি স্বয়ং বাচ্চাদেরকে নিজের সামনে বসিয়ে তাদেরকে আলোর দিশা জানাচ্ছেন। যেমনটি জন্ম-লগ্নেই প্রতিটি বাচ্চারই নিজের নিজের অধিকারের ভাগ্য নিরুপণ হয়। ঠিক তেমনটি অসীম জগতের (বেহদের) বেলাতেও ঘটে। তাই তো তোমরা বাচ্চারাও প্রতি কল্পেই নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যকে আলোকিত করো - যা পরে আবার তমসাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তোমরা যখন পবিত্র পাবন অবস্থায় আসো, তখনই ভাগ্যের বিকাশ ঘটে। পবিত্রতাকেই পাবন গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। এই 'আশ্রম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমের বিপরীত শব্দ অপবিত্র পতিত ধর্ম; - সেখানে আশ্রম শব্দটির প্রয়োগ হয় না। এমনিতে গৃহস্থ ধর্ম তো সকলেরই জন্য। এমন কি তা পশু-পক্ষীদের ক্ষেত্রেও। বাচ্চা তো সবারই থাকে। পশু-পক্ষীরাও তাদের নিজ নিজ গৃহস্থ ধর্ম পালন করে। যা এখন তোমরা বাচ্চারাই তা অনুভব করতে পারবে। একদা তোমরাই স্বর্গ-রাজ্যের পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমেই ছিলে, যখন তোমরা ছিলে দেবী-দেবতা। আজ তাদেরই গুন-মহিমাকে সর্বগুণ সম্পন্ন বলে কীর্ত্তণ করা হয়। তোমরা নিজেরাও আবার তা করে থাকো। এখন তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারছো, তোমরাই আবার মনুষ্য থেকে দেবতায় রূপান্তরিত হতে যাচ্ছো। দেবী-দেবতাদেরও নিজস্ব ধর্ম থাকে। এদিকে আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকেও দেবতা বলা হয়। ব্রহ্মা দেবতাকে নমঃ, বিষ্ণু

দেবতাকে নমঃ ..... কিন্তু শিবের বেলায় বলা হয়- শিব-পরমাত্মাকে নমঃ। অতএব পার্থক্য তো আছেই। আবার শিব আর শংকরকেও এক বলা যাবে না। যারা তা বলে, তা পাথরবুদ্ধি বা র্নিবুদ্ধিতারই পরিচয় দেয় মাত্র। তোমরা এখন স্পর্শমণি পরস- পাথরের মতন সুবুদ্ধিধারী হতে যাচ্ছো। দেবতাদের তো আর র্নিবুদ্ধিধারী বলা যায় না। আবার অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে, রাবণ-রাজ্য শুরু হলেই, ধীরে ধীরে আত্মাদের পতনও তো শুরু হবে। তখন আত্মারা সুবুদ্ধিধারী থেকে র্নিবুদ্ধিধারী অর্থাৎ পাথর বুদ্ধির হতে থাকে। আত্মাদের বুদ্ধিমান বানাতে পারেন এক ও একমাত্র বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা। যিনি তোমাদেরকে পরশমণির মতন সুবুদ্ধিধারী বানাচ্ছেন। আর সে উদ্দেশ্যেই তো তোমরা এখানে আসো। এই পারস-নাথের (শিব) অনেক মন্দিরও আছে, সেখানে বিশাল আকারের মেলাও বসে। কিন্তু, সাধারণেরা এটাই তো জানে না- এই পারস-নাথ প্রকৃত কে? বাস্তবে পারস-বুদ্ধি বনাতে পারে কেবল একমাত্র এই বাবা। যিনি বুদ্ধিমানদেরও বুদ্ধিদাতা। সেই বুদ্ধি-ই তো তোমাদের বুদ্ধির খোরাক (খাদ্য)। কিন্তু, সেই বুদ্ধিরও আবার রূপান্তর ঘটে। তাই তো সতর্ক করে বলা হয় - খারাপ কিছু দেখো না, খারাপ কিছু শুনো না, খারাপ কিছু বোলো না। -যা বাঁদরের ছবি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে- অথচ তা বাঁদরদের উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু। এই মনুষ্যরাই যখন বাঁদরের মতন আচরণ করে, সেক্ষেত্রে তাদেরকে একপ্রকার বাঁদর-ই বলা চলে। আবার এও বলা হয়ে থাকে- মনুষ্যরাই পূর্বে বন-মানুষ ছিল, তাই বনমানুষের সাথেও তুলনা করা হয়। অর্থাৎ যা কিনা জঙ্গলের (কাঁটার) রাজত্ব। যেহেতু, একে অপরকে কত ভাবেই নস দুঃখ দিয়ে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের বুদ্ধি দিয়ে তা বিচারও করতে পারো। যেহেতু বাবা স্বয়ং সেই বুদ্ধির যোগান দিচ্ছেন। তাই তো এই জ্ঞানের পাঠ-কে জ্ঞান-অমৃত বলা হয়। যা জল বা অন্য কিছুর অমৃত নয়। আজকাল তো কত কিছুকেই অমৃত বলা হয়ে থাকে। গঙ্গা-জলকেও অমৃত বলে। দেবতাদের পদযুগল ধোয়া জলকেও অমৃত জ্ঞানে পান করে। যারা সেই অমৃত পান করে, তারা কিন্তু পতিত-পাপী থেকে পবিত্র-পুণ্যবান হয়ে যায় না। গঙ্গাজলের বিষয়ে বলা হয়- পতিত পাবনী। কেউ মারা গেলে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া রীতি আছে। আবার এও কথিত আছে যে, অর্জুন তীর মেরে, (ভীষ্মকে) গঙ্গাজল পান করান। অথচ (তোমাদের) বাচ্চাদেরকে কিন্তু কোনো তীর চালাতে হয় না। কোনও এক গ্রামে তো তীরের লড়াই চলে। সেখানকার রাজাকে আবার ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। বাবা বলেন - এ সবই ভক্তি-মার্গের গুরুদের তৈরী করা পদ্ধতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গুরু তো কেবল একজনই- যিনি সদ্গুরু। যিনি সবারই সদ্গতি দাতা। তিনি এক ও একমাত্র একজনই। যিনি সবাইকেই সাথে করে পরমধামে নিয়ে যান। সেই বাবা ছাড়া অন্য কেউ-ই সেখানে নিয়ে যেতে পারেন না। আর ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাওয়া তো যায়-ই না। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট সে ভাবেই খোঁদিত। যা চক্রাকারে সেই অনাদি-কাল থেকেই আবর্তিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর ইতিহাস-ভূগোলও সেই অনুসারেই পুনরাবৃর্ত্তি হতে থাকে। যা এখন তোমরা অনুভব করতে পারছো। মনুষ্যরা অর্থাৎ আত্মারা তাদের প্রকৃত বাবা, যিনি এ সবের রচয়িতা - তাকেই তো জানে না। অথচ তাঁর কথা কিন্তু সুপ্ত ভাবে স্মরণেও আছে। তাই তো বলে ওঠে --ও গড় ফাদর, হে ভগবান, ওহে ঈশ্বর। অথচ জাগতিক লৌকিক বাবার ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটি বলে না। গড় ফাদার, হে ভগবান যখন বলে, তা তখন খুব সম্মান ও ভক্তিভরেই বলে থাকে। আবার ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলে থাকে-- পতিত-পাবন, দুঃখ-মোচনকারী ও সুখ-প্রদানকারী। ওনাকে একদিকে যেমন তা বলা হচ্ছে, কিন্তু যখন কোনও দুঃখের ঘটনা ঘটে বা সন্তানাদির মৃত্যু ঘটলে, তখন আবার দোষারোপ ও বিলাপ করে বলে - যে ঈশ্বর সুখ দাতা সেই ঈশ্বরই আবার দুঃখ দাতা। এই ঈশ্বরই আমার সন্তানের প্রাণ ছিনিয়ে নিল। এমনটা উনি কেন করলেন। এভাবে ঈশ্বরকেই গালমন্দ করতে থাকে। বাবা তখন

জানতে চান, ঈশ্বর যদি তোমাকে বাচ্চা দিয়ে থাকে - তা আবার ফিরিয়ে নিলে, তখন তোমরা দুঃখের বিলাপ করে কাঁদতে থাকো কেন ? সে তো ঈশ্বরের কাছেই গেছে। সত্যযুগে কিন্তু কেউ কাঁদে না বা বিলাপ-দোষারোপ করে না। কারণ, তখন সেই অবস্থাই আসে না। আত্মারা তাদের কর্মফলের হিসাব-কিতাব অনুসারে যে যার কর্তব্য-কর্মের কাজটুকুই করে থাকে। এই জ্ঞানের অভাবে মানুষ কতই না কান্নাকাটি করে থাকে। পাগলের মত প্রলাপ বকতে থাকে। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - মা মারা গেলেও হালুয়া খাও। (অর্থাৎ শোকে বিলাপ না করে শান্ত-চিত্তে নিজের কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন কর।) লৌকিক বাবার ক্ষেত্রেও এমনটি করো। এই ভাবেই তো নষ্টমোহা (মোহ শূন্য) হতে হয়। সর্বদা স্মরণে রাখতে হয় - আমার আপন তো কেবল এক ও একমাত্র অসীমের (বেহদের) বাবা, যেখানে আর কারও কোনও স্থান নেই। বাচ্চাদের মধ্যে এই অবস্থা আসা উচিত। যেমনটি ছিলেন মোহজীত রাজা। সত্যযুগে তো কোনও প্রকারের দুঃখই আসে না। সেখানে কখনও অকাল মৃত্যুও ঘটে না। তখন আত্মারা কালকেও (মৃত্যুকেও) জয় করে। আর এই বাবাকে বলা হয় মহাকাল। অর্থাৎ যিনি কালেরও কাল। তোমাদের সেই কালের উপরেই বিজয় প্রাপ্ত প্রাপ্ত করতে হবে। অর্থাৎ কাল যেন তোমাদের শেষ করতে না পারে। আত্মাকে বা শরীরকে কাল শেষ করতে পারে না। আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে, অন্য শরীর ধারণ করে। তাকেই আখ্যা দেওয়া হয়, কালের কবলে শেষ হয়ে গেল। বস্তুতঃ, কাল তো কোনও বস্তু বা জিনিষ নয়। অজ্ঞানী মনুষ্যেরাই তার এই ধরনের মহিমা কীর্তন করে থাকে, এ বিষয়ে যার কোনও জ্ঞানই নেই তাদের। অগত্যা কেশবই - কেশব! বাবা আরও বোঝাচ্ছেন, এই যে ৫ বিকার আছে, এরা তোমাদের বুদ্ধিকে কত ভাবেই নষ্ট করে দেয়। যেহেতু বর্তমান সময়ে এরা কেউ বাবাকে সেভাবে জানে না, তাই তো এই দুনিয়াকে অনাথের দুনিয়া বলা হয়। নিজেদের মধ্যেই একে অপরের সাথে কি ভয়ঙ্কর লড়াই-ঝগড়ায় মত্ত। অথচ তারা মনেই রাখে না এই দুনিয়াটা তো আমাদের বাবার-ই ঘর। বাবা স্বয়ং এই দুনিয়াতে আসেন সমস্ত বাচ্চাকেই পতিত থেকে পবিত্র পাবন বানাতেই। অর্দ্ধেক কল্প তো সম্পূর্ণ পবিত্র দুনিয়াই ছিল। তার গুনগান তো এখনও করা হয়, রাম রাজা, রাম প্রজা (অর্থাৎ রাজাও যেমন সুখী, প্রজাও তদ্রুপ সুখী) - যেখানে অধর্ম বলে কোনও কথাই নেই। প্রবাদও আছে, যেখানে বাঘে-গরুতে এক ঘাটেই জল খায়। তাই তো সেখানে রাবণ-মায়ারও কোনও ঠাঁই নেই। অন্যেরা তো তা বোঝেই না-বরঞ্চ তারা এসব শুনে হাঁসতেই থাকে। বাবা স্বয়ং এসে এই জ্ঞান দেন, যেহেতু বর্তমানের এই দুনিয়াটার একেবারেই পতিত অবস্থা। শুধু প্রেরণার দ্বারা কি আর পতিতদেরকে পবিত্র পাবন বানানো যায় ! তাই তো বাবাকে ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন তুমি আসো, আর তাই উঁনিও তখন ভারত-ভূমিতে অবতরণ করে বলেন, আমিই সেই জ্ঞানের সাগর তোমাদের কাছে এসেছি- তোমাদের মাস্টার জ্ঞান-সাগর বানাতে। সেই কারণেই বাবাকে প্রকৃত ব্যাসদেব বলা হয়। আর তোমরা হলে তার বাচ্চা সুখদেব। তোমরাই সুখ দাতা দেবতায় রূপান্তরিত হও। যা হবার লক্ষ্যে তোমরা, ব্যাসদেবের অর্থাৎ শিবাচার্যের থেকে সুখের আশীর্ব্বাদী-বর্সা নিচ্ছো। অতএব তোমরা হলে ব্যাসদেবের সন্তান । যেন মানুষ গুলিয়ে না ফেলে, তাই তোমাদেরকে শিবের বাচ্চা বলে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু ওনার আসল নাম শিব। আত্মাকে যেমন উপলব্ধি করা যায়, তেমনি পরমাত্মাকেও উপলব্ধি করা যায়। যিনি ধরায় অবতীর্ণ হয়ে পতিতদের পবিত্র পাবন হওয়ার দিশা দেখান। আর উঁনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে জানান- আমিই তোমাদের আত্মাদের বাবা (পরমাত্মা)। অনেকটা বুড়ো আঙ্গুলের আকারের মতন। তবে অত বড় আকারের নয় - যা অতি সূক্ষ্ম আকারের। চিকিৎসকদেরও এ বিষয়ে খুবই আগ্রহে রয়েছে, তাকে দেখার জন্য। কিন্তু তাকে তো এই চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। তাকে কেবল অনুভব করা যায় মাত্র। এইবার বাবা বাচ্চাদের কাছে জানতে চাইছেন

- তারা কি আত্মাকে অনুভব করেছে ? এত ক্ষুদ্র আত্মাতে এত বিস্তর অবিনাশী কর্ম-কর্তব্যের পার্ট খোঁদিত হয়ে আছে। যেমনটি রেকর্ডের মধ্যে থাকে। এই পাঠ ধারণের পূর্বে তোমরা দেহ-অভিমানী স্থিতিতে ছিলে, যা এখন দেহী-অভিমানী (আত্মিক) স্থিতিতে পৌঁছেছো। এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে যে, আত্মারা কিভাবে ৮৪ বার জন্ম নিয়ে থাকে। যার কোনও বিনাশ হয় না। কেউ কেউ আবার এটাও জানার আগ্রহ করে, এই অবিনাশী বিশ্ব নাটকের শুরু কবে হয়েছিল। কিন্তু, এই নাটক তো অবিনাশী বিশ্ব-নাটক। তোমরা বাচ্চারা তো এখন ব্রহ্মাণ্ডকেও জানো। যেরূপে পড়া তৈরী না করা বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করা হয় ও নানা ভাবে তা শেখানো হয়, বাবাও সেভাবেই তোমাদেরকে পাঠ পড়াচ্ছেন। আত্মারাই শরীর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেই পাঠ পড়ছে। নির্বুদ্ধির লোকেদের জন্য যা 'বুদ্ধির-ভোজন'-এর কাজ করে। আর বুদ্ধিধারীদের বোধশক্তি বাড়ে। তোমাদের বাচ্চাদের উদ্দেশ্যেই বাবা তাই এত সব চিত্র বানিয়েছেন। যা খুবই সহজ ও সরল প্রক্রিয়ার। যেমন- ত্রিমূর্ত্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। এবার প্রশ্ন হলো- ব্রহ্মাকেই কেন ত্রিমূর্ত্তি বলা হয় ! দেব-দেব মহাদেব। একের মধ্যেই অপরের যোগ। এসব তো কেউ জানেই না। আচ্ছা, এখানে তবে ব্রহ্মা কি করে আসে, যেখানে বলা হয় উনি প্রজাদের পিতা। উনি আবার সূক্ষ্ম-বতনের দেবতা হন কি প্রকারে ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার তো এই জগতেই থাকা উচিত। যা কোনও শাস্ত্র বা পুঁথি-পত্রে নেই। বাবা তখন জানান - আমিই (শিব) ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে, এনার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তোমাদেরকে সব কিছু বলে থাকি। কর্ম করার এবং করাবার উদ্দেশ্যে এনাকেই আমি আমার রথ হিসাবে ব্যাবহার করি। এনার অনেক জন্মের পরে এই অন্তিম জন্মেই আমি আসি। তাই তো এনাকে ৫ বিকার থেকে সন্ন্যাস (মুক্ত) হতে হয়। যারা সন্ন্যাস গ্রহন করেন, তাদেরকে যোগী বা ঋষি আখ্যা দেওয়া হয়। সে হিসেবে তোমরাও রাজঋষি। যেহেতু তোমরাও তাদের মতন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। জাগতিক সন্ন্যাসীরা তো বাড়ী-ঘর, সংসার ত্যাগী হয়, কিন্তু এখানে স্ত্রী-পুরুষ সবাই একত্রেই থাকে। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়- বিকার থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে। সব কিছুর মূলেই এই বিকার। তোমরা তো জানো-ই যে, শিববাবা রচয়িতা। যিনি সব কিছুই নব সাজে রচনা করেন। যিনি সবেরই বীজরূপ আবার সৎ-চিত-আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগরও। এ সবের স্থাপনা, পালনা, বিনাশ কি প্রকারে ঘটে- তা কেবল একমাত্র বাবা-ই জানেন। যার ধারণা মনুষ্যদের নেই। কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এখন এই সব ব্যাপারগুলি বুঝতে পারছো। তাই তো অন্যদেরকেও তা সঠিক ভাবে বোঝাতেও পারো। আচ্ছা ! মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ সুমনের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেক আত্মারই তাদের নিজ নিজ কর্মফলের হিসেব-নিকেশ, একেবারেই তাদের নিজস্ব ব্যাপার। অতএব আত্মা শরীর ত্যাগ করলে, কান্নাকাটি করা উচিত নয় মোটেই। সম্পূর্ণরূপে নষ্টমোহা ভাবে থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। মনে যেন এটাই থাকে যে, আমার আপন তো একজনই, যিনি সেই অসীম পারের (শিব) বাবা। আর অন্য কেউ-ই আমার আপন নয়।

২) বুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে ফেলে যে ৫ বিকার, সেগুলিকে অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। দেবতাদের মতন নিজের সুখের ভান্ডার থেকে সবাইকে সুখ বিতরণ করতে হবে। আমার দ্বারা বা কারনে কেউ যেন কোনও প্রকারেরই দুঃখ না পায়।

বরদান :- সর্ব প্রকার আত্মাদের পতিত সংকল্প বা পতিত বৃত্তিগুলিকে ভষ্মে পরিণত করার যোগ্যতা সম্পন্ন মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হও (ভব)!

সূর্য যেমন নিজের কিরণের দ্বারা নোংরা, ময়লা, জীবানুগুলিকে ভষ্মে পরিণত করে, সেই প্রকার তোমাদেরও মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হয়ে, যে কোনও পতিত আত্মাকে দেখলেই - তার পতিত সংকল্প, পতিত বৃত্তি, বা পতিত দৃষ্টিকে ভষ্মে পরিণত করতে হবে। যেহেতু শক্তিশালী পতিত-পাবনী আত্মার উপরে পতিত সংকল্প অ-কার্যকরী হয়ে পড়ে। তাই পতিত আত্মারা পতিত-পাবনীদের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। আর এই শক্তির অধিকারী হওয়ার লক্ষ্যে মানসিক ভাবে নিজেকে প্রচন্ড শক্তিশালী অর্থাৎ মাস্টার জ্ঞান-সূর্য স্থিতিতে সর্বদাই স্থিত থাকো।

স্লোগান :- নিজেকে ধারণা-স্বরূপ বানিয়ে সবাইকে যোগী জীবনের প্রভাবে প্রভাবিত করতে হবে - যা অনেক বড় সেবার সামিল।